# বৈষম্যমুক্ত দেশ গঠনে অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতি

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টোটল সর্বপ্রথম দুর্নীতি শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপর শব্দটি ব্যবহার করেন দার্শনিক সিসারো ঘুষ এবং সৎ অভ্যাস ত্যাগ প্রত্যয় যোগে । দুর্নীতি দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আদর্শের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অসাধুতা বা বিচ্যুতিকে বুঝায়। অধ্যাপক মরিস এর মতে; ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার হলো দুর্নীতি।

বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠন এবং মানবসভ্যতা বিকাশে দুর্নীতি অন্যতম অন্তরায়। এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। সাধারণত সম্পদে অপ্রতুল দেশগুলোতে দুর্নীতি বেশি রয়েছে। অধিকাংশ অপরাধের উৎস হিসেবে দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়াও অপরাধ দমনেও এটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দুর্নীতি শুধু গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করেনা বরং কখনো কখনো সন্ত্রাসবাদকেও উৎসাহিত করে। পাশাপাশি সমাজের মূল কাঠামোর ক্ষয় সাধন, অর্থনীতির উন্নয়নে বাধা, জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকাশিত রূপ হলো ঘুষ, অনুপ্রবেশ, অর্থপাচার, অবৈধ লেনদেন, নেপোটিজম, স্বজনপ্রীতি, বিশেষ সুবিধা প্রদান, কর্ম ক্ষেত্রে ফাঁকি দেওয়া, বিধি বহির্ভূত সুবিধা গ্রহণ, আইনবিরুদ্ধ সুবিধা গ্রহণ ও প্রদান, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি। এছাড়াও অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা petty corruption এবং সরকার বা বড়ো আকারে প্রভাবিত হয়ে কারো দ্বারা grand corruption ও হতে দেখা যায়।

বৈশ্বিক দুর্নীতি সূচকে স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যাবলিতে বাংলাদেশের অবস্থান কখনোই সন্তোষজনক দেখা যায়নি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর দুর্নীতির ধারণা সূচক অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকার এক নম্বর অর্থাৎ শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ছিল। পরবর্তীতে ২০২১ সালেও তার তেমন পরিবর্তন না হয়ে সিপিআই সূচকে ১৩ তম অবস্থানে থাকে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের টিআই ২০২৩ এর প্রতিবেদনে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ১৮০ টি দেশের মধ্যে নিম্নক্রমে বাংলাদেশকে ১০ তম উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ বিগত দুই যুগেও দুর্নীতি রোধে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশে সংঘটিত পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যতম দুর্নীতির ঘটনাগুলো হলো, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে খাদ্যদ্রব্রের কেলেঙ্কারি, বিদ্যুতের খাম্বা কেলেঙ্কারি, হলমার্ক অর্থ লোপাট কেলেঙ্কারি, রূপপুরের বহুল আলোচিত বালিশ কান্ড, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পর্দা কেলেঙ্কারি, ক্যাসিনো কান্ড, বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি,জনতা ব্যাংকের অ্যাননটেক্স, নির্মাণ কাজে দেশের বিভিন্ন স্থানে রডের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহার, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্ন ফাঁস, মতিউরের ছাগল কান্ড, সাবেক আইজিপির আলাদিনের চেরাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও অন্যান্য, করোনাকালীন জৈনক ডাক্তারের কান্ড। এছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রশাসন, মর্মে মিডিয়ার বদৌলতে সর্বজনবিদিত। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মামলাবাজি, টোলবাজি জাতীয় দুর্নীতি সন্ত্রাসী দুর্নীতির চরিত্র ধারণ করে সমাজে অবস্থান করছে।

দেশের দুর্নীতিচক্রে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ভূমিকা খুবই শক্তিশালী। চাকরিবিধির প্রতি অবজ্ঞা করে এক শ্রেণির সরকারি কর্মচারীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। আইনের দুর্বলতা, শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব ও দলীয়করণের ফলে দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরা সহজেই দুর্নীতি করে পার পেয়ে যায় এবং পুনরায় দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এটি একটি চেইনের মত হয়ে পড়েছে।

বেসরকারি খাতের অনেক কোম্পানি বিভিন্নভাবে দুর্নীতি করে থাকে। ব্যক্তিগত কর ফাঁকি দেওয়া, আমদানি রপ্তানিতে ইনভয়েসিং ও ওভার ভয়েসসিংয়ের মাধ্যমে কর ফাঁকি এবং প্রকৃত সম্পদ ও লাভের পরিমাণ গোপন করার দুর্নীতি সম্পর্কিত সংবাদ অহরহ পত্রিকায় এসে থাকে।

দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ২০০৪ সালের ৯ই মে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়। এছাড়াও দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯, চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন ২০১০, জনসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন ২০১১, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ ইত্যাদি। এই আইনগুলো দুর্নীতি দমনে সহায়ক আইন হিসেবে বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করে। কিন্তু অদৃশ্য এক কারণে এতসব আইনের ফলেও দুর্নীতি হ্রাস ও দুর্নীতি নিরোধে সূচক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়নি। এজন্য আইনের ব্যর্থতা নয় বরং আইন প্রয়োগের ব্যর্থতাকেই দায়ী মনে করছেন সুশীল সমাজ ও নাগরিক গোষ্ঠী। দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশের পূর্ববর্তী প্রত্যেক সরকারই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা কাগুজে বাঘের মতই কাগজে-কলমে থেকে গেছে। ফলাফলের দিক থেকে অনুত্তীর্ণই বলা যায় সেগুলোকে।

দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে ব্যক্তি থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করা জরুরি। মানুষের মধ্যে রয়েছে শুভ বোধ ও অশুভ বোধের সত্ত্বা। যাকে আমরা ভালো ও মন্দ মনও বলতে পারি। মানুষের মনের পরিবর্তন কখন কীভাবে ঘটবে, তা বলা প্রায় অসম্ভব। মানুষের মনের মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে দুর্নীতিকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য ধর্মীয়, সামাজিক, মানবিক ও সৃষ্টিশীল মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ধর্মীয়, সামাজিক, মানবিক, সৃষ্টিশীল বিধান ও বিষয়ের প্রচার-প্রসারে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী চিন্তা চেতনার বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে হবে। পরিবার থেকে রাষ্ট্র সর্বত্র মূল্যবোধ সম্পন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তির সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিসহ অন্যান্য মানবীয় গুণাবলিকে সম্মান করতে হবে।

দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব দুর্নীতি দমনে অধিক। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ঝুঁকি নিরাপত্তা, দক্ষতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে প্রয়োজন দুর্নীতিহীন প্রতিষ্ঠান - এ স্লোগানকে নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী এ ধরনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা জনগণের প্রতি এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার অঙ্গীকার জোরালোভাবে সর্বত্র তুলে ধরতে হবে। এজন্য স্বচ্ছ প্রশাসন, জবাবদিহিমূলক সরকার, দুর্নীতিমুক্ত নীতিমালা গ্রহণ, দুর্নীতি দমনে স্বচ্ছ রাজনৈতিক অঙ্গীকার, দুর্নীতি দমনে আইনের যথার্থ ও বৈষম্যমুক্ত প্রয়োগ, সরকারের সকল বিভাগে নৈতিকতা সম্পন্ন স্বচ্ছতা, সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সর্বত্র নির্লোভ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পদায়ন ও নেতৃত্ব প্রদান, দুর্নীতি নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্নীতির বিষয়ে দ্রুত ও প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

#

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার

পিআইডি ফিচার